কর্ণপুরাণ

নাট্যোপন্যাস

কর্ণপুরাণ

ড. মুকিদ চৌধুরী

আদিত্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
কাকলি বেগম
আদিত্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯০৬৭৮৬০৪, ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
একমাত্র পরিবেশক
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Nattouponnaash Karnopuran by **Dr. Mukid Choudhury**
Published by Kakoli Begum

Adittya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 90678604, 01919664970
e-mail : adittya.prokash@gmail.com

Only Distributor
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970

First Published : February 2021

Price : 300.00
US $ 10

ISBN 978 984 95441 1 1

ঘরে বসে আদিত্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

ভিক্টোরিয়া কলেজ থিয়েটার, কুমিল্লা-এর
নাট্যকর্মীবৃন্দ

প্রধান চরিত্র

ব্যাসদেব লেখকগোষ্ঠীর সম্মিলিত নাম

অধিরথ বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জের অঙ্গরাজ্যের রাজা

রাধা অধিরথের স্ত্রী, প্রাচ্যনারী

কর্ণ অধিরথ-রাধার পুত্র, অঙ্গরাজপুত্র

বসুষেণ অধিরথ-রাধার পোষ্যপুত্র, কুন্তী-দুর্বাসার পুত্র

দুর্বাসা বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজপ্রতিনিধি

কুন্তিভোজ যাদব রাজা

কুন্তী কুন্তিভোজের দত্তক কন্যা

পরশুরাম ব্রহ্মাস্ত্রগুরু

কৃপাচার্য শরদ্বানের পুত্র, দ্রোণাচার্যের শ্যালক, রণবিদ

দ্রোণাচার্য ভরদ্বাজের পুত্র, কৃপাচার্যের ভগ্নীপতি, অস্ত্রাচার্য

অশ্বত্থামা দ্রোণাচার্য ও কৃপীর পুত্র

দেবব্রত/ ভীষ্ম হস্তিনাপুরের প্রথম রাজা শান্তনু ও গঙ্গাদ্বারের গঙ্গার পুত্র

ধৃতরাষ্ট্র দেবব্রতের ভ্রাতুষ্পুত্র, হস্তিনাপুরের মহারাজ

পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা

গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী, গান্ধার রাজকুমারী

শকুনি গান্ধারীর ভ্রাতা, গান্ধার রাজকুমার

বিদুর হস্তিনাপুরের অমাত্য, ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (দাসীপুত্র)

দ্রুপদ পাঞ্চালরাজ

দ্রৌপদী পাঞ্চাল রাজকুমারী

ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল রাজকুমার

শিখণ্ডী লিঙ্গান্তর পাঞ্চাল রাজকুমার

শল্য মদ্ররাজ

জয়দ্রথ সিন্ধুরাজ ও ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলার পতি

বাসুদেব অর্জুনসখা

পাণ্ডব রাজপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব

কৌরব রাজপুত্র দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্মুখ

দুঃশলা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পত্নী

প্রাক্‌কথন

মহাভারতের মূল কাহিনির বীজ সৃষ্টির প্রধান স্থান ছিল আর্যের আর্যাবর্ত এবং অনার্যের সুবিশাল ও বৃহত্তর প্রাচ্যদেশ অর্থাৎ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধ-পুণ্ড্র-সুহ্ম-সমতট ইত্যাদি নিয়ে গঠিত বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জ। কালব্যাপ্তি : পরিণত হরপ্পান পর্যায়ের সভ্যতার যে-কোনো এক সময়।

বৈদিক আর্যশক্তি সামরিকভাবে বৃহত্তর প্রাচ্যদেশ কখনো অর্জন করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠিতও হয়নি। বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জের অনার্য বা অবৈদিক প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বই এর প্রমাণ। বৈদিক আর্যশক্তি কোনো-এক দৃঢ়বদ্ধ কেন্দ্র ও একজন ব্যক্তির নেতৃত্ব না-থাকায় বৈদিক আর্যশ্রেণি পূর্বদিকের বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জের অনার্যশক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে দুর্বল ছিল। তাই বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাচ্যবাসীকে তারা পক্ষির সঙ্গে তুলনা করে। তাদের সঙ্গে না মেশার জন্য বিধিবিধান তৈরি করে। তারপরও কোনো আর্যঋষি (আর্যব্রাহ্মণ) যদি গোপনে বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জে এসে উপস্থিত হয়, তাহলে সে এই অনার্য জাতির সঙ্গে আপসের মাধ্যমে বর্ণজাতিভেদভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার দিকে অগ্রসর হয়। সেইসঙ্গে প্রাচ্যবাসীর ধর্মবিশ্বাস ও অর্চনাপদ্ধতির সঙ্গে আপসের মাধ্যমে নিরাকার দেবতার পরিবর্তে সাকার দেবতা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অনার্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রচুর সংখ্যক অবৈদিক কাহিনি-গাথা-কাব্য-সাহিত্য ছিল সেসবকে বৈদিক আর্যযুগে কিংবা পরবর্তীতে আর্যঋষিরা আর্যধর্ম (ব্রাহ্মণ্যধর্ম)-এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ধ্বংস কিংবা নষ্ট করে দেয়। যেগুলো বেশি জনপ্রিয় ছিল সেগুলোকে আর্যঋষিরা তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনে সংস্কার বা পরিবর্তন করে আর্য বা ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার উপযোগী করে তোলে, অনার্য সম্পদ দখল ও ভোগ করার জন্য। উল্লেখ্য, মহাভারত যুদ্ধের ঘটনার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ এবং বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জে আর্যকেন্দ্রিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং পরবর্তীকালে এই ঘটনার মূল স্মৃতি যতটা সম্ভব মুছে ফেলা বা বিলুপ্ত

করা বৈদিক আর্যঋষিদের জন্য প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

মহাভারতের আদি গাথা বা কাব্য হচ্ছে অনার্য উপজাতি জোটের ও আর্য রাজাদের মধ্যকার যুদ্ধের পরিবর্তিত পৌরাণিক এবং মহাকাব্যিক রূপ। তবে এই দুই পক্ষের প্রধান চরিত্রদের যে নামগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলোর সমস্ত না হলেও অধিকাংশ পরবর্তীকালে দেওয়া হয়; কারণ, কয়েকটি প্রধান দেবতার নাম ঋগ্‌বেদে পাওয়া গেলেও পাণ্ডবদের (যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ইত্যাদি) এবং কৌরবদের (দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি) নামগুলো পাওয়া যায় না। কালক্রমে তাদের নাম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বদলানো কিংবা নতুন চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে।

একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে জন্ম নেওয়া কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এই মহাকাব্য। বস্তুত মহাভারত এমন এক বিশাল মহাকাব্য যার ভেতর রয়েছে হাজার বছর ধরে সৃষ্ট ভারত উপমহাদেশের বিপুলসংখ্যক গল্পের জাল বিস্তার। বহু গল্পের পেছনে যেমন আছে ঘটনার অভিঘাত তেমনি নিছক কল্পিত ঘটনার জাল বিস্তারও হয়েছে, বিশেষ এক সামাজিক চাহিদা পূরণের তাগিদ থেকে। অনেক উদ্ভট ও অসম্ভব বা অবাস্তব কাহিনির সন্নিবেশ এই মহাভারতের ভিত্তিকে অনেক সময় প্রশ্নসাপেক্ষ করে, যার সত্যতা বা অসত্যতা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে। বস্তুত পঞ্চপাণ্ডবের জন্মবৃত্তান্ত, তাদের বিয়ে, এমনকি তাদের পিতা পাণ্ডু এবং দুই পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের জন্মবৃত্তান্ত মূলত বিবাহপ্রথার পূর্বের আর্য সমাজচিত্র অঙ্কন করে। এটি সহজে অনুমান করা চলে যে, মহাভারতের মূল চরিত্রগুলো যে-কালের সেইকালে আর্যসমাজে এক স্বামীভিত্তিক বিবাহপ্রথা এবং নারীর সতীত্বসম্পর্কিত মূল্যবোধ ছিল না, অথবা কোনো শক্তভিত্তির ওপর দাঁড়ায়নি। অন্যদিকে, বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জের সমাজ কৃষি ও বাণিজ্যের বিকাশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র (বঙ্গবগধ) গঠন ও নগর (তাম্রলিপ্ত, গঙ্গাঋদ্ধি, গাঙ্গেয়, পুণ্ড্র ইত্যাদি) সৃষ্টির পথে অনেকটা অগ্রসর হলে পরিবারপ্রথা, এক-নারীর এক-পতি, এক-পতির এক-স্ত্রী ইত্যাদি দৃঢ়বদ্ধভাবে স্থাপিত হয়। অবশ্য এই ধরনের পরিবারপ্রথা এবং মূল্যবোধ কৃষিসভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত; কারণ, লাঙলভিত্তিক কৃষির বিকাশ জমিতে যেমন কোনো-না-কোনো ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানা অপরিহার্য করে তোলে, তেমনি লাঙলনির্ভর কৃষিতে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাও অনিবার্য হয়ে পড়ে। জমি হয় নারী। বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জ সব সময়ই ছিল মাতৃতান্ত্রিক ভূমি; মূল আর্যভূমির মতো পিতৃতান্ত্রিক অবশ্যি ছিল না। ফলে আর্যঋষিদের আবির্ভাবে ও প্রভাবে

বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জে জমির মালিকানায় পুরুষ প্রাধান্য সৃষ্টি হয়। আর তাই পরবর্তীতে দেখা যায়, প্রাচ্যবাসীর আদি সমাজের এক-নারীর এক-পতি, এক-পতির এক-স্ত্রী আর্যঋষিদের প্রভাবে হয়ে ওঠে এক-পুরুষের এক-স্ত্রী বা বহু-স্ত্রী। বৈদিক আর্যরা অবশ্য এক-স্ত্রীর এক-স্বামী বা বহু-স্বামীর কথাও বলে, এমনকি বিবাহিত স্ত্রী অন্য পুরুষদ্বারা সন্তানলাভ করা বৈধ বলে মেনে নেয়। এসব অবশ্য প্রাচ্যবাসী কখনো মেনে নিতে পারেনি।

আর্যঋষিবৃন্দদ্বারা বিকৃত মহাভারত কাহিনি মূলত দুই ভাই পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যকার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিস্তার করা হয়েছে। পাণ্ডুর পুত্র হিসেবে পরিচিত পঞ্চপাণ্ডবের কেউই তাঁর ঔরসজাত পুত্র নয়। সকলেই পাণ্ডুর দুই স্ত্রীর গর্ভে চার উপজাতির নেতাকর্তৃক জন্মপ্রাপ্ত। পাণ্ডুর প্রথম স্ত্রী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম (বিদুর), বায়ু (পবন) এবং অগ্নি (ইন্দ্র) কর্তৃক জন্মপ্রাপ্ত যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং অর্জুন। অপরদিকে, পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রীর গর্ভে জন্ম নেয় অশ্বিনীকুমারদ্বয় (যুগ্ম বা যমজ ভ্রাতা) কর্তৃক জন্মপ্রাপ্ত নকুল ও সহদেব। এই হলো আর্যঋষিবৃন্দদ্বারা বিকৃত মহাকাব্য মহাভারত অনুযায়ী পঞ্চপাণ্ডবের জন্মবৃত্তান্ত। এই পাঁচ ভ্রাতা আবার একত্রে বিয়ে করে দ্রৌপদী নামের একজন রমণীকে। অন্যদিকে, ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারীর গর্ভজাত দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্মুখ প্রমুখ শতপুত্র জন্মগ্রহণ করে, মূলত তারা হচ্ছে শত অনার্য প্রাচ্য নেতা, অর্থাৎ বঙ্গমগধ রাষ্ট্রপুঞ্জের শতবীর।

রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন তার ভ্রাতাদের সহযোগিতায় পাণ্ডুক্ষেত্রজপুত্র পঞ্চপাণ্ডবকে রাজ্যচ্যুত করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে। সে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়া বা জুয়াখেলায় পরাজিত করে রাজ্যচ্যুত করে। এমনকি সর্বসমক্ষে রাজসভায় দ্রৌপদীকে অপমান করে। এই দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পঞ্চপাণ্ডব দেশত্যাগ করে। অবশেষে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। একে বলা হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে একদিকে যুক্ত হয় অনেক অনার্য রাজা ও সেনাবাহিনী; অন্যদিকে মূল আর্যাবর্তের বিভিন্ন নেতা, রথ ও রথী। এই যুদ্ধে দুর্যোধনপক্ষ পরাজিত ও ধ্বংস হয়। পঞ্চপাণ্ডব রাজ্য ফিরে পায়। যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করে। কিন্তু জ্ঞাতিহত্যা ও বিপুল রক্তক্ষয়ে যুধিষ্ঠিরের মন অশান্ত থাকে। ছত্রিশ বছর রাজ্যশাসন করার পর সে তার ভ্রাতা অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়ে মহাপ্রস্থানে গমন করে। দ্রৌপদী এবং বাকি চার ভাই তাকে অনুসরণ করে। তারা সকলেই ভূপতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তবে ধর্মদেবের পুত্র যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করে। এসব

আর্যঋষিবৃন্দদ্বারা বিকৃত মহাভরতের কথা, কর্ণ মহাভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশ নয়, বিশাল অংশ নিয়েই তার প্রভাব; তবে কর্ণপুরাণের মর্মগাথার যে অন্তর্গত সত্য ও শক্তি তা আর্যঋষিবৃন্দদ্বারা বিকৃত মহাভারতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। মহাভারত পাঠকালে কর্ণকে মনে হয় সে যেন আমাদের মানুষ, অনার্য বাঙালি। তাই তাকে দেখতে ইচ্ছে হয় অন্যভাবে, কৌরব ও পাণ্ডব রাজপুত্রের চেয়েও কুশলী বীররূপে। তাই এই নাট্যোপন্যাসে সর্বতোভাবে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। মহাভারতের আর্য-আখ্যানজুড়ে আছে, প্রকটভাবে, হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ-প্রতিহিংসা-যুদ্ধ এবং কুটিল-জটিল রাজনীতি। আর এসব প্রকাশ করতেই অনার্য বীরদের করা হয়েছে অসহায়। কিন্তু এই নাট্যোপন্যাসে কর্ণ অসহায় নয়, বরং বীরবাঙালি।

মহাভারতে বাসুদেব একজন রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক আর্য-ঈশ্বর। তিনি ইতিহাসকে রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি আর্যদেরকে "জমি দেবো, দেশ দেবো" বলে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান করেছেন। আজও ভারতবর্ষের মূল আলোড়নগুলো ঘটছে একই আহ্বানে; কখনো ঈশ্বরনিঃসৃত, আবার কখনো মনুষ্যনিঃসৃত। এই আহ্বানকে সামনে রেখে চলছে ধর্ম-লীলা-যুদ্ধ। মহাভারতে বাসুদেব আর্যধর্ম দিয়ে বিচ্ছিন্ন করেছেন আর্য ও অনার্যকে। এই বিভাজনবৃত্তি আজও বর্তমান। এই বিভাজন থেকেই কর্ণপুরাণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কাহিনি পুরাণপ্রতীকী। বিক্ষত এর পাত্রপাত্রী। আদিকালে আর্যদের রাজাই দেবতা বা ঈশ্বর। অর্ধেক পার্থিব, অর্ধেক অলৌকিক। তাঁরাই পৃথিবী শাসন করে স্বর্গে ফিরে যান। রাজার মহত্ত্বের সঙ্গে দেবতার মহত্ত্ব সমানুপাতে একাধারে সম্মিলিত। এই রাজা বা ঈশ্বরকে কেন্দ্র করেই ধর্মরাজ্য বা আর্যাবর্ত সৃষ্টি করতে চেয়েছে বৈদিক আর্যরা। ফলে আর্যধর্মের রাজনৈতিক ঈশ্বর বা রাজা আর্যদের ইতিহাসের নিয়ন্তা। আর্যধর্ম-রাজনীতি-ইতিহাসের স্রষ্টা ঋগ্‌বেদ; সহযোগী রামায়ণ, মহাভারত। এসবই আর্যধর্ম ও আর্যরাজনীতির আর্যাধ্যায়ের সূচক।

কর্ণপুরাণ নাট্যোপন্যাসটি পুরোপুরি মহাভারতভিত্তিক নয়, রয়েছে কল্পনাও। রয়েছে মানবিক দ্বন্দ্বও। এই দ্বন্দ্বের বীজ দিব্যতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সংঘাত থেকে উদ্‌গত। দিব্যতন্ত্র থেকে বাসুদেবের উদ্‌গম, রাজতন্ত্র থেকে পাণ্ডবদের উত্থান। এখানে বাসুদেব কিন্তু ঈশ্বর নন, শুধু মানুষ। বৈদিক আর্যসাহিত্যে তিনি প্রথমে ঈশ্বর তারপর ঈশ্বররূপী মানব হলেও অনার্য সাহিত্যে তিনি শুধু মানুষ। তাই এই নাট্যোপন্যাসে তিনি

কেবল মানুষ হিসেবেই উদ্ভাসিত। বৈদিক আর্যসাহিত্যের উপেক্ষিত অনার্য জাতি এখানে উপেক্ষিত হয়নি; কারণ, তারাও ইতিহাসের অন্তর্গত। তাই আর্য ও অনার্যের দ্বন্দ্ব দিয়েই এই নাট্যোপন্যাসের শুরু।

আবরণাবতরণপর্বাধ্যায়

অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ পরিবেশ। নেপথ্যে আর্যমন্ত্রপাঠের শব্দ শোনা যায়। গাইছে— গাইব আর্যগীত। উচ্চারিত হবে আর্যবিজয়। বৈদিক আর্যরা তো মূল আর্যভূমি থেকে নির্বাসিত হয়ে এই অসুর-অনার্য ভারতবর্ষে এসেছিল। এসেছিল অনার্য সিন্ধুর বেলাভূমিতে। তারাই ধ্বংস করেছিল শানিত প্রতিহিংসানলে অসুর-অনার্য সভ্যজাতিসমূহকে। অতঃপর প্রতিষ্ঠা করেছিল এই অসুর-অনার্য অঞ্চলে মূল আর্যভূমির— আরিয়ান ভায়েজার[১] আর্যদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য, সোম, যম, ইন্দ্র ও বরুণকে।

আর্যমন্ত্রপাঠ ক্রমশ ম্লান হতে থাকে। এক সময় নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আশ্রমমৃত্তিকার মধ্যখানে শুকনো বালির একটি বৃত্তের মধ্যে জটলা বেঁধে, একের-পর-এক আর্যযোদ্ধা এই মুহূর্তে অনার্য রণবিদ্যা কালারি রণচর্চায় লিপ্ত। বালির ওপর হাত বুলিয়ে তারা বালি ও মৃত্তিকার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার শব্দ সৃষ্টি করে চলেছে। তারা সকলই প্রায় দিগম্বর। লোকশ্রুতি রয়েছে, এই আশ্রম ভারতবর্ষের আর্যাবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ রণবিদ্যালয়। যদি ভাগ্য অনুকূল হয়, তাহলে এই আশ্রম হয়ে উঠবে বৈদিক আর্যদের প্রধান রণচর্চাকেন্দ্র। তাই গোপনে অস্ত্র-রথসমেত যোদ্ধা ও রথীদের এখানে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। আর্যঋষিরা তাদের প্রস্তুত করছেন। তাদেরই রক্তের বিনিময়ে একদিন জন্ম নেবে বৈদিক আর্যদের এই ভারতবর্ষে আর্যভূমি— দ্বিতীয় আর্যাবর্ত। বিস্তৃত হবে আর্যপ্রভুত্বের অধিকার। আর্যঋষিদের কাছে অসুর-অনার্য ঘৃণিত জাতিসমূহ। কিন্তু এই অসুর-অনার্যরা ভারতবর্ষের আদি জাতিসমূহ। এই জাতিসমূহের প্রতি ক্রোধ এবং ক্রোধের তীব্র বেদনা শুরু হয়েছিল সেইদিন, যেদিন অসুর-অনার্যতাণ্ডবে আর্যদেরকে মাতৃভূমি—

১ আরিয়ান ভায়েজা। বর্তমানে ইরান, আফগানিস্তান ও তুর্কমেনিয়ার সীমানায় অবস্থিত ছিল।

পারশিয়ার আর্যাবর্ত ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেই স্মৃতি এখনো তাদের রক্তের গভীরে অপমানঅগ্নি প্রজ্বলিত করে রেখেছে। এই আশ্রমই কি শুধু আর্যক্রোধবিদ্বেষে আচ্ছন্ন? আর্যদের মন যতক্ষণ অস্ত্রবিদ্যার প্রশিক্ষণে ডুবে থাকে ততক্ষণ এসব ফিকে থাকে। কিন্তু যখন আসে নিজেদের প্রতি ধিক্কার তখনই আবার প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। এই ক্রোধবিদ্বেষ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত আর্যমনের চিরসাথি। অন্তরের নিভৃত মণিকক্ষে এই ক্রোধবিদ্বেষ চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে।

উত্তেজিত মনে এসব ভাবতে ভাবতেই আর্যযোদ্ধাদের কেন্দ্রবিন্দুতে, হঠাৎ অস্পষ্ট আলোর মতো এসে দাঁড়ালেন ব্যাসদেব। ললাটে আর্যঈশ্বর ব্রহ্মার বিজয়তিলক আঁকা। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। তাঁর চোখের দীপ্তি আর মুখের জ্যোতি ম্লান। তবে ব্রহ্মাভক্তির এক তীব্র আভাসমিশ্রিত রয়েছে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ চেহারায়। তাঁর মাথায় বিপুল টাক। এই টাকের মধ্যে যেন এক গভীর রহস্য ছড়িয়ে রয়েছে। পৃষ্ঠে একটি টিকা দুলছে। তিনি অক্ষরে অক্ষরে আর্যনীতির উগ্ররণবিশুদ্ধতা পালন করেন। উগ্রবিশুদ্ধ রণনীতির আদর্শ রক্ষার জন্যই এই আশ্রমটি স্থাপন করেছেন। তিনি এই আশ্রমের ঋষিপ্রধান। পরনে গেরুয়া রঙের একখণ্ড বস্ত্র। তার কোথাও একটু বিশৃঙ্খলা নেই। তাঁর আকৃতি-প্রকৃতিতে প্রগাঢ় প্রভুত্ব রয়েছে। নিজের প্রভুত্বেই এই আশ্রমকে শাসন করেন। শৃঙ্খলে কিংবা অন্ধকার কারাকক্ষে অবদমিত করে রাখেন যাকে ইচ্ছে তাকে। বন্ধনের দুঃসহতায় কেউ কেউ আবার বাঁধনের মধ্যেই পাক খেয়ে মরে।

তখন কেবল প্রভাতের অরুণরাগরেখা দেখা দিয়েছে। সূর্য এখনো ওঠেনি। তার প্রখর কিরণরশ্মি বিকীর্ণ করতে শুরু করেনি। ব্যাসদেবকে ঘিরে একজন যোদ্ধা সূর্যপ্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। অতঃপর অন্যরাও। একজনের সূর্যপ্রণামচক্র পূর্ণ হওয়ার আগেই আরেকজন সূর্যপ্রণাম শুরু করে। উঠে দাঁড়ায়। অবশ্যি কেউই একসঙ্গে সূর্যপ্রণাম করল না— কেউ উঠছে, কেউ নুয়ে পড়ছে, কেউবা অর্ধচক্রে। মরুভূমিতে যেন মানুষের চলাচলের এক অপূর্ব দৃশ্য।

সকলের সূর্যপ্রণাম শেষ হলে ব্যাসদেব একটি উচ্চাসনে আসীন হলেন। হাতে তাঁর মরচে-ধরা আর্যদণ্ড। এই আর্যদণ্ড দ্বারাই তিনি তাঁর ক্রোধবিদ্বেষ অপ্রশমিত করতে সক্ষম হয়েছেন। না হলে নিঃসন্দেহে সমস্ত অসুর-অনার্য ভারতবর্ষকে দ্রুত উড়িয়ে মহাশূন্যে ভাসিয়ে

দিতেন। এই মরচে-ধরা আর্যদণ্ড দিয়েই তিনি আর্যযোদ্ধাদের সঙ্গে নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে শাসন অথবা তাদের ক্রোধ শিথিল করেন।

মরচে-ধরা আর্যদণ্ডটি এক সময় মৃত্তিকায় আঘাত করলেন ব্যাসদেব। সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভূকম্পন শুরু হয়ে গেল। একমুহূর্তে পঞ্চনদের তরঙ্গ যেন গড়িয়ে দিলো তার পাশের ভূকূল। মেঘগুলো দখল করে নিল সূর্যকে। বজ্রগর্জনে মুখরিত হলো চারদিক। শুরু হলো বিদ্যুচ্চমক। মৃত্যু যেন আসন্ন। তখনই আবার আর্যনীতিরক্ষী ব্যাসদেব তাঁর মরচে-ধরা আর্যদণ্ডটি তুলে নিলেন মৃত্তিকার বুক থেকে। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, সুখী তোমরা আর্যযোদ্ধাগণ। অনেক অনেক সুখী তোমরা। আমাকে তোমাদের সামনে পেয়ে সৌভাগ্যলাভ করেছ। আর্যযোদ্ধাগণ, এখন বুঝতে পারছ কেন আমি মৃত্যুবরণ করিনি। এখনো কেন এই মৃত্তিকা থেকে অনার্যদের অস্ত্রাঘাতে বিতাড়িত করেনি। কারণ, তোমাদেরকে শক্তিমান করতে হবে। করতে হবে রণচর্চার মাধ্যমে। আর্যযোদ্ধাগণ, বিগত অপমানের অভিজ্ঞতা তো তোমাদের রয়েছে। এর চাইতেও কঠোর অপমান তোমাদের সহ্য করতে হবে। আর্যদেবকুল একদিন আমাদের আপমানের অবসান ঘটানোর জন্য এগিয়ে আসবেন। জাগিয়ে তুলবেন আর্যপৌরুষ। সরিয়ে দেবেন ভয়হতাশা। ধৈর্য ধরো, শুভদিনের জন্য তৈরি হও।

ব্যাসদেব গভীর উদ্‌বেগে অবসন্ন হয়ে চোখেমুখে আশার ভঙ্গি ফুটিয়ে তাঁর মনের দুঃসহ যন্ত্রণা বুকের মধ্যে চেপে রাখলেন। কিছুক্ষণ নির্ভীকভাবে তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর ব্যাসদেবের আদেশে আজকের মতো রণচর্চা শেষ হলো।

তখনই এক কিশোর ব্যাসদেবের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, প্রণাম মহাঋষি, আমি বসুষেণ।

ভদ্রতা রক্ষার জন্য মৃদু হেসে ব্যাসদেব বললেন, আয়ুষ্মান হও পুত্র।

বসুষেণের মুখ শুভ্র হাসিতে ভরে উঠল। নিঃসংকোচে সহজ কণ্ঠে সে বলল, কেন এই তিরস্কার! উপহাসের মতো আশীর্বাদ কেন আপনার।

ব্যাসদেবের প্রশান্ত মুখখানি এখন অপ্রশান্ত। দ্বিধায়, সংকোচে এই প্রভাতে ব্যাসদেবের কপাল ঘেমে উঠল। বুক দুরুদুরু করে কাঁপছে।

একবার ভাবলেন, বসুষেণের কথার উত্তর দেবেন না; পরক্ষণে মনে হলো, উত্তর না দিলে তাঁর পক্ষে অভদ্রতা হবে। তাই ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে হেসে শুধালেন, তিরস্কার? আমার বিদ্যার এ কী পুরস্কার? এভাবে বুঝি তুমি আমার হাতের আর্যদণ্ডের অপমান করছ? এই আর্যদণ্ড কি তোমাকে সাক্ষী দেয় না অসুর-অনার্যদের মোটেই আর্যরা সহ্য করতে পারে না। তবুও বলছি, ভয় কোরো না। আমার আশ্রমে তোমার ভাগ্য অপরিবর্তিতই থাকবে।

বসুষেণের পক্ষে চুপ থাকা অসম্ভব। সাহস সঞ্চয় করে সে বলল, আপনি মহানুভব। আপনি আর্যনক্ষত্র। অতুলনীয়। তবুও বলতে হয় মহাঋষি, আর্যদণ্ডের প্রবল শক্তিদ্বারা বিতাড়িত করতে চাইছেন অসুর-অনার্যদের তাদের মাতৃভূমি থেকে।

বসুষেণের এই সরল কথায় ব্যাসদেব যেন মনে মনে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন। তবে বসুষেণের আশঙ্কিত ভাব দেখে একটু অপ্রস্তুত হলেন। রাগে ফুঁসে বসুষেণের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, মনে রেখো বৎস, আর্যদের সর্বজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা বাস করতেন মেরুপর্বত অতিক্রম করে উত্তর কুরুবর্ষে (আরিয়ান ভায়েজায়)। জগৎসংসার সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অনেক। তাই বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আসত তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে। কুরুবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য, সোম, যম, ইন্দ্র ও বরুণ। তাঁদের নাম অনুসারেই বিভিন্ন রাজ্যের নামকরণ করা হয় ব্রহ্মালোক, বিষ্ণুলোক, সূর্যলোক, সোমলোক, যমলোক, ইন্দ্রলোক ও বরুণলোক। সেসব দেশের লোকরাই মহাভারতের আর্যদের পূর্বপুরুষ। তাই অসুর-অনার্যদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না আর্যদের।

বসুষেণ গাঢ়স্বরে বলল, প্রাকৃতিক কারণেই কুরুবর্ষের রাজ্যগুলো ধ্বংস হয়েছিল। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়।

সহসা সম্মুখে সাপ দেখলে লোকে যেমন আঁতকে ওঠে, ব্যাসদেবেরও কতকটা সেই অবস্থা হলো। তিনি কয়েকমুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলেন না। তারপর একটু বিস্মিতভাবে, ঈষৎ বিষণ্নভাবে, কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে শুধালেন, প্রশ্ন?

একটা বিদ্রূপের হাসি বসুষেণের অধরে ফুটে উঠল। সে ব্যাসদেবের মরচে-ধরা আর্যদণ্ডের দিকে দৃষ্টি রেখে বলল, আজ্ঞে, আপনি অসুর-অনার্য শৌর্যবীর্য দিয়েই তো গড়লেন কর্ণকে, আবার

আর্যকে দিয়েই ঘটালেন তার বিনাশ। কী আশ্চর্য আপনার রহস্যপ্রকাশ!

একমুহূর্ত নীরব থেকে বিচিত্র ভঙ্গিতে বসুষেণের দিকে তাকিয়ে ব্যাসদেব বললেন, এই কথা! তারপর তাঁর বড়ো বড়ো চোখদুটি কৌতুকপূর্ণ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে যোগ করলেন, এ তার অসুর-অনার্য কর্মযোগের অনিবার্যতা।

বসুষেণের মুখের গাম্ভীর্য প্রগাঢ় হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে অপ্রসন্ন কণ্ঠে এবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করল, হে মহাঋষি, অসুর-অনার্য বলেই কি তার করলেন এমন সর্বনাশ! তবে জানতে ইচ্ছে হয়, আর্যদের পঞ্চপাণ্ডব আর অর্জুনসখা বাসুদেব কী হয় আপনার?

বসুষেণ জানে, কঠোর আর্যনীতিবিদ ব্যাসদেবও এই ব্রহ্মাস্ত্রের বেগ সংবরণ করতে পারবেন না। তার অনুমান ব্যর্থ হয়নি। ব্যাসদেব ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, সেকথা জেনে তোমার কী লাভ?

এবার বসুষেণ আর তার হাসি দমন করতে পারল না। তার কর্ণমূল ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠল। অতঃপর মৃদু হেসে ভূমিতলে ঈষৎ উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, জানি, সবই জানি, আর্য কিংবা বৈদিক ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়বৃন্দ আপনার কেউ নয়। কী নিষ্ঠুর পরিবর্তন আপনার! অসুর-অনার্য জেলেকন্যা সত্যকালীর[২] গর্ভে, পরাশরের ঔরসজাত অবৈধপুত্র[৩] আপনি। যদিও আপনার পিতা পরাশর সত্যকালীর নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন যোজনগন্ধা তবুও আপনি আসলে মৎস্যগন্ধার পুত্রই। খেয়াপারাপারের নৌকায় আপনাকে সৃজন করা হয়েছিল। তবে কী জেগেছিল মনে অভিলাষ হতে আর্যপুত্র? তাই বুঝি সত্যকে ঢাকতে গড়লেন কর্ণকে আমার স্বরূপে। যদিও আপনি জানেন কর্ণ ও আমি এক নই, তবুও গড়লেন আমাদের একই ব্যক্তি করে। এমন করলেন স্বীয় পরিচয় প্রকাশ যেন না হয়, সেই ভয়ে; নাকি কর্ণের প্রতি সদয় ও উদার মনোভাব গ্রহণ করে তাকে নির্মাণ করলেন আর্যযোদ্ধা হিসেবে?

---

২ সত্যবাদী, কৃষ্ণবর্ণা, অনার্য নারী, জেলেনন্দিনী, মৎস্যগন্ধা, তরণিবাহিকা ইত্যাদি নামে তার পরিচয়।

৩ কানীনপুত্র।